নব-বৃন্দাবন

(গল্পগ্রন্থ – মেঘমল্লার)

কর্ণপুর সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন।

সংসারে তাঁহার কেহই ছিল না। স্ত্রী পাঁচ-ছয় বছর মারা গিয়াছে, একটি দশ বৎসরের পুত্র ছিল, সেও গত শরৎকালে শারদীয় পূজার অষ্টমীর দিনে হঠাৎ বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করিয়াছে। সংসারের অন্য বন্ধন কিছুই নাই। বিষয়-সম্পত্তি যাহা ছিল, সেগুলি সব জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের দিয়া অত্যন্ত পুরাতন তালপত্রে কয়েকখানি ভক্তি-গ্রন্থ জীর্ণ তসরের পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া পদব্রজে বৃন্দাবন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কর্ণপুরের জন্মপল্লী অজয় নদের ধারে। তিনি পরম বৈষ্ণবের সন্তান। অজয়ের জলের গৈরিক দুই তীরের বন-তুলসী মঞ্জরীর ঘ্রাণে কোন শৈশবেই তাঁর বৈষ্ণব ধর্মে মানসিক দীক্ষা হয়। তিনি গ্রামের টোলে উত্তমরূপে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। দুই-একটি ছাত্রকে কিছুকাল স্মৃতি ও বৈদ্যক শাস্ত্রও পড়াইয়াছিলেন। ছাত্রেরা দেখিত তাহাদের অধ্যাপক মাঝে মাঝে ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া সমস্ত দিন কাঁদেন। পাগল বলিয়া অখ্যাতি রটাতে ছাত্রেরা ছাড়িয়া গেল, প্রতিবেশীরা তাচ্ছিল্য করিতে শুরু করিল, তাহার উপর প্রথমে স্ত্রী, তৎপরে পুত্রের মৃত্যু। সংসারের উপর কর্ণপুর নিতান্তই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

যাইবার সময় জ্ঞাতি-ভ্রাতা রসরাজ আসিয়া মায়াকান্না কাঁদিল, গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বহুদিন ধরিয়া কর্ণপুরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার পর হইতেই সে তাঁহাকে বাজিজ্ঞানে শত হস্ত দূরে রাখিয়া চলিয়া আসিতেছিল। আজ যখন সে দেখিল কর্ণপুর সত্য সত্যই বাহির হইয়া যাইতেছেন, ফিরিবার কোন আশঙ্কাই নাই, তখন সে আসিয়া মহা পীড়াপীড়ি শুরু করিল—আর কয়েকটা মাস থাকুন, যে করিয়া পারি ঋণটা শোধ করিয়া ফেলি, কারণ ঋণ পাপ ইত্যাদি। উদারচিত্ত কর্ণপুর এসব কপট প্রবন্ধ বুঝিলেন না। তিনি রসরাজকে তাঁহার প্রার্থনা মত তাল-দীঘির পাড়ের আশুধান্যের একটুকরা উৎকৃষ্ট ভূমি দানপত্র করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ অধমর্ণকে বলিলেন—এক কড়া কড়ি আন ভায়া, গ্রহণ করিয়া তোমায় ঋণমুক্ত করি।

আপনার বলিতে কেহ না থাকায় গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহার জন্য সত্যকার ভাবনা কেহই ভাবিল না। শৈশব-স্মৃতির প্রথম দিনটি হইতে পরিচিত মাটির চণ্ডীমণ্ডপ, স্বহস্তরোপিত কত ফল-ফুলের গাছ, কত খেলা-ধুলার জন্মভিটার আঙ্গিনা পিছনে ফেলিয়া চলিলেন, ফিরিয়াও চাহিলেন না, শুধু গ্রামসীমার অজয়ের ধারে গিয়া কর্ণপুর একটুখানি দাঁড়াইলেন।....অজয়ের ধারে প্রাচীন শিরীষ গাছের তলে গ্রামের শ্মশান, কয়েক মাস পূর্বে তিনি মাতৃহীন বালক পুত্রটিকে এইখানে দাহ করিয়া গিয়াছেন। অজয় আর বাড়ে নাই, সুতরাং সে চিতার চিহ্ন এখনও একেবারে বিলীন হয় নাই। তার কচিমুখের অবোধ হাসিটুকু মনে পড়িয়া গেল, মৃত্যুর পূর্বে শ্বাসকষ্টে বড় যন্ত্রণা পাইয়াছিল, সে সময়কার তার আতঙ্কে আকুল অসহায় দৃষ্টি মনে পড়িল। কর্ণপুর অবাক হইয়া অজয়ের ওপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন ....ধূ ধূ গৈরিক বালুরাশির শয্যায় জীর্ণ-শীর্ণ নদ অবসন্ন দেহ প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, উপরে এখানে-ওখানে এক-আধটা দিকহারা মেঘশিশু আকাশের কোন কোণ হইতে বাহির হইয়া তখনই আবার সুদূর অনন্তের পথে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, কোথাও কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে না। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। পৃষ্ঠের পুঁটুলিতে কয়েকখানি বস্ত্র, সামান্য কিছু তণ্ডুল ও অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, দক্ষিণ হস্তে মাধবীলতার আঁকাবাঁকা একগাছি দৃঢ় যষ্টি, বাম হস্তে একটি পিতলের ঘটি মাত্র লইয়া অজয় পার হইয়া কর্ণপুর পশ্চিম মুখে যাত্রা করিলেন।....জীবনে যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু পরিচিত ছিল—সবই এপারে রহিয়া গেল।

দিনের পর দিন তিনি অবিশ্রান্ত পথ চলিতে লাগিলেন। এক-একদিন সন্ধ্যার সময় কোন গ্রামের চটিতে, নয়তো কোন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইতেন। গ্রামপথে চলিবার সময় লোকে আদর করিয়া গৃহত্যাগী সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণের পুঁটুলি ভরিয়া খাদ্যদ্রব্য দিত, পিতলের ঘটিটা পূর্ণ করিয়া নির্জলা খাঁটি দুগ্ধ দিত; তিনি কোন দিন তাহার সামান্য অংশ খাইতেন, কোন দিন কোন দরিদ্র পথযাত্রী ভিক্ষুক বা কোন বুভুক্ষু কুকুরকে খাওয়াইতেন। কত গ্রাম, হাট, মাঠ, কত সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যের গঞ্জ, কত নদী উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে যাইতে অবশেষে তিনি বসতি-বিরল খুব বড় বড় নির্জন মাঠ ও বনজঙ্গলের পথে আসিয়া পড়িলেন। চিরকাল নিতান্ত ঘরোয়া-ধরনের গৃহস্থ, বিদেশে কখনই বাহির হন নাই ; সূর্য ডুবিয়া যাওয়ার পরই দিগন্ত বিস্তৃত জনহীন প্রান্তরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত ; কর্ণপুর একস্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে লোকালয়ের অন্বেষণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন—লোকালয় মিলিত না, তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় হইত যদি কোন বন্যজন্তু বা কোন দস্যু আসিয়া আক্রমণ করে !.... পরক্ষণেই ভাবিতেন, আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ, দস্যুতে আমার কি কাড়িয়া লইবে ? অজয়ের ধারের বৃদ্ধ শিরীষ বক্ষতলে এক ধূসর হেমন্ত-সন্ধ্যার কথা মনে পড়িলেই অমনি কর্ণপুরের মন হইতে বন্যজন্তুর ভয় দূর হইত। বনের পথে চলিতে চলিতে অন্য খাদ্য মিলিত না, কোন দিন বুনো কুল, মহুয়া ফুল,

কোন দিন বা ছোট তালচারার নবোদ্গাত পত্রকোরক খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন ; অঞ্জলি পুরিয়া পার্বত্য নদীর জলধারা পান করিতেন। মাঝে মাঝে আবার গ্রামও পাইতেন।

সন্ধ্যার সময় সেদিন তিনি একটি তালবনে আশ্রয় লইলেন। নিকটে লোকালয় নাই, পাথুরে মাটিতে অভ্রকণিকা চিক্ চিক্ করিতেছে, একটু পরে তালবনের পিছনে সূর্য ডুবিয়া। গেল।....সন্ধ্যার আকাশে পঞ্চমীর একফালি চাঁদ।....।

সেদিন পথে এক ভিক্ষুকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হইয়াছিল, তিন-চার মাস পূর্বে জীবিকার চেষ্টায় বাড়ীর বাহির হইয়া কিছু উপার্জন করিয়া সেদিন সে বাড়ী ফিরিতেছে। বাড়ীতে তার ছোট ছোট দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে আছে, তাদের মুখের দিকে চাহিয়া সে প্রবাসের কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে নাই। ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলির মধ্যে রাঙা রাঙা পাথরের নুড়ি, নূতন ধরনের পাখীর রঙীন পালক, নানা তুচ্ছ জিনিস সযত্নে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের খেলনা করিতে।...কর্ণপুরের মনে হইয়াছিল সেদিন—দূর, মূর্খ সংসারাসক্ত জীব !...আজ কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনে জাগিল ঐ ভিক্ষুকটা তাঁহার চেয়ে সুখী। সে তো তবুও কতদিন পরে গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহার গৃহ কোথায় !....পরক্ষণেই দুর্বলতাটুকু বুঝিয়া ফেলিয়া অপ্রতিভ হইয়া ভাবিলেন, ভগবান দয়া করিয়াই সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া লইয়াছেন। ভালই তো, ইহাতে মন খারাপ করিবার কি আছে ?

তাহার পর বসিয়া বসিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তালবনের মাথায় পঞ্চমীর চাঁদের দিকে চাহিয়া বার বার গাঢ়স্বরে শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিতেছিল। রাত্রির পাতলা জ্যোস্নায়, মাঠের নির্জনতায়, শ্লোকের পদ-লালিত্যে তাহার মনে কি একটা অব্যক্ত ব্যথা যেন ক্রমেই মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। সেটাকে চাপা দিবার জন্য তিনি বসিয়া ইষ্টদেবতার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইষ্টদেবের মূর্তি কল্পনা করিতে গিয়া কর্ণপুরের মনে হইল, ঐ অনন্ত আকাশের মত উদার-প্রাণ, ঐ জ্যোৎস্নার মত অনাবিল, চারিধারের প্রান্তর-বনের মত শান্ত তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ । এই শ্লোকের ললিত শব্দের মত তাঁর বাণী মধুর, শ্যামায়মান বনভূমির মতই তাঁর স্নিগ্ধ কান্তি....কিন্তু তাহার মুখটি কল্পনা করিতে গিয়া কেমন করিয়া কর্ণপুর বার বার তাঁহার মৃতপুত্রের মুখটিই ভাবিতে লাগিলেন। তাহাকে দাহ করিবার সময় হইতে কর্ণপুর সে মুখটি কখনই ভোলেন নাই, মনে কেমন আঁটিয়া ছিল। সেই মুখ ছাড়া অন্য কোন মুখ তাঁহার ভাল লাগে না। নিজের কাছে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করিতে চাহিলেও কর্ণপুরের মনের গোপন কোণে একথা জাগিতেছিল, ইষ্টদেব যদি তাঁর পুত্রের রূপ ধরিয়া দেখা দেন, তবে না সুখ ! যদি কখনও দেখা পান, তার যেন পুত্রের সেই রূপেই পান।

শেষ রাতের স্বপ্নে কর্ণপুর দেখিলেন, জ্যোৎস্না দিয়া গড়া দেহ তাঁরই ছেলেটি আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছে।....তাঁর মৃতপুত্রের মুখটি খুব সুশ্রী ছিল, তবুও তাহার মুখের যেখানে যাহা কিছু ছোটখাট খুঁত ছিল, সেই সুন্দর অতি- প্রিয় খুঁতগুলি ঠিক সেই ভাবেই আছে। বাম ভুরুর উপরে শান্তশিষ্টতার জয়-তিলকটি এখনও তো বিলীন হয় নাই, সেই রকম পাগলের হাসি।....আস্তে আস্তে সে তার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি ডাক দিল—বাবা !.... অনেক দিন-হারা-পুত্রকে ক্ষুধার্ত ব্যগ্র দুই হাতে জড়াইয়া ধরিতে গিয়া কর্ণপুরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলেন সকাল তো হইয়াছেই, তালবনের মাথায় রৌদ্রও উঠিয়া গিয়াছে।।

সকালে উঠিয়া তিনি পুনরায় পথ চলিতে শুরু করিলেন। পথে কয়েকখানা গ্রাম পাইলেও তিনি কোথাও বিলম্ব করিলেন না। সারাদিন পথ চলিবার পরে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দূর হইতে একটি ছোটখাট গ্রাম দেখা গেল। অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় সম্মুখে লোকালয় দেখিয়া কর্ণপুরের মনে বড় স্বস্তিবোধ হইল। আশ্রয় স্থান সন্ধানে তিনি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রামপ্রান্তের প্রথম দুই-চারিখানা বাড়ী ছাড়াইয়া গ্রামের ভিতর অল্প দূর অগ্রসর হইতে হইতেই গ্রামের দৃশ্য যেন কর্ণপুরের কাছে কেমন কেমন ঠেকিল। কোন গৃহস্থ-বাড়ীতেই কোন সাড়াশব্দ নাই, কোন বাড়ী হইতেই রন্ধনের ধুম উঠিতেছে না, পথে পথিকের যাতায়াত নাই, জনপ্রাণী কোনদিকে চোখে পড়ে না। অধিকাংশ গৃহস্থবাটির বাহির দরজা খোলা— খোলা দরজা দিয়া চাহিলে বাটীর ভিতর একখানা কাপড় পর্যন্ত দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য বোধ হইলেও সারাদিনের পথশ্রমে কর্ণপুর এত ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে—অতশত ভাবিবার, বুঝিবার বা ব্যাপার কি অনুসন্ধান করিবার অবস্থা তাঁহার ছিল না। তিনি সম্মুখে এক গৃহস্থ বাটীর বাহিরের ঘরে গিয়া উঠিলেন ও মোট পুঁটুলি নামাইয়া বিশ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।....দণ্ড দুই কাটিয়া গেল, অথচ বাড়ীর ভিতর হইতে কোন মনুষ্য-কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিল না। সম্মুখের পথ দিয়া এই দুই দণ্ডের মধ্যে মানুষ তো দূরের কথা একটি গৃহপালিত পশুকে পর্যন্ত যাইতে দেখিলেন না। ততক্ষণে তিনি

অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন ; ভাবিলেন, এই বাড়ীটার মধ্যে ঢুকিয়া দেখা যাউক, লোকজনেরা কি করিতেছে ।

বাড়ীর মধ্যে পায়ে পায়ে ঢুকিয়া যাহা তাঁহার চোখে পড়িল তাহাতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, ঘরের মধ্যে তিনটি মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া আছে, মৃত্যু অনেকক্ষণ পূর্বে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গিয়া দেখিলেন, গৃহতলে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ শয্যার উপর পড়িয়া আছে, মৃতদেহের পাশে একটি অনিন্দ্যসুন্দর-গৌরবর্ণ শিশু খল্বল্ করিয়া শয্যার পাশে বেড়াইতেছে ও ঘরের আড়া হইতে ঝুলিয়া পড়া একগাছি মাকড়সার জালের অগ্রভাগে দোদুল্যমান একটি মাকড়সার দিকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে যাইতেছে এবং আপন মনে হাসিতেছে।

ভাবগতিকে কর্ণপুর অনুমান করিলেন কোন ভীষণ মহামারীর আবির্ভাবে দুই একদিনের মধ্যে গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে মৃতদেহ রাশি হইয়া আছে, সৎকারের মানুষ নাই, দেখিবার মানুষ নাই, হয়তো যাহারা। বাঁচিয়াছিল তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গিয়াছে।

কর্ণপুরকে দেখিয়া শিশু একগাল হাসিয়া হাত বাড়াইল। তাহার মা যে খুব বেশীক্ষণ মারা যায় নাই, ইহা দুইটি বিষয়ে তাঁহার অনুমান হইল। প্রথমতঃ এই ক্ষুদ্র শিশুটি ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত হইয়া পড়িলে এতক্ষণ এরূপ হাসিত না, কিছুক্ষণ পূর্বে তাহার মা জীবিতাবস্থায় তাহাকে স্তন্যপান করাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মৃতদেহের এতটুকু বিকৃতি হয় নাই, শিশুর মা যেন এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আসন্ন মৃত্যু ও ঘনীভূত বিপদের সম্মুখে পড়িয়াও অবোধ শিশুর এই নিশ্চিন্ত হাসি ও ক্রীড়া দেখিয়া কর্ণপুরের মনে হইল, বাল্যকালে অজয়ের তীরের বনে তিনি এক প্রকার পতঙ্গকে লক্ষ্য করিতেন, সূর্যের আলোতে খেলা করিবার অধীর আনন্দে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে কোথা হইতে রাশি রাশি আসিয়া জুটিত এবং খানিকক্ষণ রৌদ্রে উড়িয়া নাচিয়া খেলা করিবার পর রৌদ্র বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-নৃত্য শেষ করিয়া মাটি ছাইয়া মরিয়া থাকিত।....কর্ণপুরের মন মমতায় গলিয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইলেন। ঘটিতে জল ছিল, বাহিরের ঘরে আসিয়া গণ্ডূষ করিয়া শিশুর মুখে ধরিতে পিপাসার তাড়নায় সে আগ্রহের সহিত উপরি উপরি বহু গণ্ডূষ জল খাইয়া ফেলিল।

তৎপরে তিনি শিশুর মাতার মুখে শুষ্ক তৃণ জ্বালাইয়া অগ্নি প্রদান করিলেন, মস্তকের কাছে কর রাখিয়া বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিলেন। এইরূপে সংক্ষিপ্ত সৎকার কার্য শেষ করিয়া তিনি শিশুকে লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে সে-বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

কর্ণপুর আবার পৈতৃক ভিটাতে ফিরিয়া আসিলেন। শুধু ফিরিয়া আসা নহে, তিনি এখন পুরামাত্রায় সংসারী। জ্ঞাতি রসরাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-বিবাদ করিয়া বিষয়-সম্পত্তি ও ধান্যরোপণের ভূমি কাড়িয়া লইয়াছেন, ব্রাহ্মণ অধমর্ণকে দু'বেলা তাগাদা করেন। দুপুর-রৌদ্রে উত্তরীয় মাথায় জড়াইয়া নিজের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধান্য বপনের তদারক করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। বৃক্ষবাটিকায় স্বহস্তে বহুদিন পরে ফল-ফুলের চারা রোপণ করেন।

কুড়াইয়া পাওয়া সেই শিশুটি এখন তাহার চক্ষের পুতলি। তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারেন না। সমস্ত সকালটি সেই বহির্বাটিতে বসিয়া শিশুকে পথের লোকজন, গরু, শিবিকা-যাত্রী, নববিবাহিত দম্পতি—এই সব দেখাইয়া তাহাকে আমোদ দেন। লোকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলে, কর্ণপুরের কাণ্ড দেখ, তীর্থের পথ হইতে এক বন্ধন জুটাইয়া আনিয়াছে । হৃতসম্পত্তি রসরাজ পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়ায়, মর্কট-বৈরাগ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে চৈতন্য মহাপ্রভু যে উক্তি করিয়াছেন তাহা কি আর মিথ্যা হইবার ? হাতের কাছে লইয়া লও প্রমাণ ! শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুলোকে কর্ণপুরের পুনরাগমনে আনন্দ প্রকাশ করেন।

কর্ণপুর এসব কথা শুনিয়াও শোনেন না। শিশু আজকাল ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বলিতে শিখিয়াছে—তাহার মুখে আধ আধ বুলি শুনিয়া তিনি দ্বাদশ বৎসর পূর্বের অন্তর্হিত আনন্দ আবার ফিরিয়া পান। তারও আগের কথা মনে হয়, যখন তাহার নববিবাহিতা পত্নী প্রথম ঘর করিতে আসিয়াছিল। পিতামাতা বর্তমানে প্রথম যৌবনের সেই সুখের দিনগুলা কত প্রভাতের বিহঙ্গ-কাকলীর সঙ্গে কত পরিশ্রম-ক্লান্ত মধ্যাহ্নে প্রিয়ার হাতের অন্ন-ব্যঞ্জনের সুঘ্রাণের সঙ্গে, অবসন্ন গ্রীষ্মদিনের শেষে উঠানের পুষ্পভারনত বাতাবী লেবু গাছটির সঙ্গে পুরাতন দিনের কত হাসি-আনন্দের স্মৃতি জড়ানো আছে। তার পরে তাঁহার প্রথম পুত্রের জন্মোৎসব, স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া কোলের শিশুকে কেন্দ্র করিয়া কত সুখ-স্বর্গ গড়িয়া তোলা ! আবার মনে হয়, জীবনটাকে বিশ বছর পিছু হটাইয়া দিয়া কে যেন পূর্ব অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করাইতেছে।

শিশুকে সামলাইয়া রাখা দায়। অনবরত হামাগুড়ি দিয়া দাওয়ার ধারে আসিতেছে—হঠাৎ একবার অত্যন্ত ধারে আসিয়া হাত পিছলাইয়া মুখ থুবড়াইয়া নীচে পড়িয়া যাইতে বসিয়াছিল—তাড়াতাড়ি আসিয়া কর্ণপুর ধরিয়া ফেলিলেন। কি একটা বিপদ ঘটিবার অজানা ভয়ে পতনোন্মুখ শিশুর অবোধ চক্ষুদুটি ডাগর হইয়া উঠিয়াছে। এ নিজের ভালও বুঝে না, এই ভাবনায় তাঁহার মন এই ক্ষুদ্র বালকের দিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়।

বন্ধন এইরূপ করিয়াই জড়ায়। ক্রমে ক্রমে কয়েক বৎসর হইয়া গেল, শিশু এক্ষণে সাতআট বৎসরের বালক। তাহার দুষ্টামির জ্বালায় কর্ণপুর দিনেরাত্রে একদণ্ড শান্তি পান না। এখানকার দ্রব্য ওখানে লইয়া গিয়া ফেলে, কখন কি করিয়া বসে। নিষিদ্ধ কার্য করিতেই তাহার আগ্রহ সর্বাপেক্ষা বেশী ।

বর্ষার দিনে কর্ণপুর তাহাকে ঘরের মধ্যে বসাইয়া পড়ান। পড়িতে পড়িতে সে ছুটি লইয়া অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে যায়। অনেকক্ষণ আসে না দেখিয়া কর্ণপুর দাওয়ায় আসিয়া দেখেন বালক অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে উঠানের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্তে মহাখুশির সহিত নাচিয়া বেড়াইতেছে। কর্ণপুর তিরস্কারের সুরে বলেন—ছিঃ বাবা নীলু, দুষ্টুমি ক'রো না। উঠে এসো।...আদর করিয়া বালকের নাম রাখিয়াছেন নীলমণি।

বালক বর্ষণ-ধৌত সুন্দর মুখখানি উঁচু করিয়া হাসিমুখে দাওয়ায় উঠিয়া আসে। শাসন করিতে কর্ণপুরের মন সরে না, মনে ভাবেন—কোথায় ছিল এর পাত্তা ? সে সন্ধ্যাবেলা যদি উঠিয়ে না আনতাম, মুখে জলের গণ্ডূষ না দিতাম—তবে ?....মমতায় তাঁহার মন আর্দ্র হইয়া পড়ে। মুখে তিরস্কার করিতে করিতে বালকের সিক্তকেশ মুছাইয়া শুস্কবস্ত্র পরাইয়া পুনরায় পড়াইতে বসেন।

আবার অন্যমনস্ক হইলে কোন ফাঁকে সে বাহির হয়। কর্ণপুর পুঁথি হইতে মুখ তুলিয়া বাহিরে গিয়া দেখেন সে দুই হাত জোড় করিয়া মুখ উঁচু করিয়া খড়ের চাল হইতে পতনোন্মুখ এক বিন্দু জল ধরিবার জন্য ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। হাত ধরিয়া আবার তাহাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনেন।

বালক উত্তমরূপে বুঝে, বাবা তাহাকে কখনো মারিবেন না।

নিজ পুত্রের শোক কর্ণপুর ইহাকে পাইয়া ভুলিয়াছেন। কেবল এক এক দিন নির্জন দ্বিপ্রহরে তাহার মুখের হাসি দূরাগত করুণ সঙ্গীতের মত মনে আসে। মনরে ইতহিাসে এই বালকরে সে অগ্রজ, রৌদ্রভরা দ্বিপ্রহরে সে-ই আসিয়া তাহার দাবী জানায়। কর্ণপুর উঠিয়া গিয়া নিদ্রিত বালকের চুলগুলির মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া দেন। মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন।

শীঘ্রই কিন্তু বালককে লইয়া তাহার বড় বিপদ হইল। এত বেশী এবং এত বিনা কারণে সে মিথ্যা কথা বলে যে কর্ণপুর রীতিমত বিপন্নবোধ করিতে লাগিলেন। নানা রকমে মিথ্যা কথনের দোষ ও সত্যভাষণের পুরস্কার সম্বন্ধে বহু গল্প উপদেশ বলিয়াও তাহাকে সংশোধন করিতে পারিলেন না। তাঁহার কাছে সে অনেক কথা আজকাল লুকায়—আগে তাহা করিত না। কর্ণপুর ইহাতে মনে মনে কষ্ট পান। তাহা ছাড়া তাহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রতিবেশীদের নিকট হইতে আসে। এ-গাছের লেবু, ও গাছের আম ছিঁড়িয়া আনিয়াছে, অমুকের ছেলেকে মারিয়াছে। কর্ণপুর বসিয়া বসিয়া ভাবেন, কোন্ বংশের ছেলে, কি কুলগত স্বভাবচরিত্র লইয়া জন্মিয়াছে কে জানে। তাহার আপন ছেলের বেলায় এগারো বৎসরেও কোন অভিযোগ তাঁহাকে শুনিতে হয় নাই কিন্তু এ-বালক তাঁহাকে এ কি মুস্কিলে ফেলিল ? ধর্মভীরু সরল-স্বভাব কর্ণপুর বালকের এসব ব্যাপারে মনে মনে বড় ব্যথিত হন। তাহার ভবিষ্যৎ কি হইবে ভাবিয়া সময় সময় ভীত হইয়া পড়েন। বালস্বভাবসুলভ চপলতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে গিয়াও মনে মনে অস্বস্তি বোধ করেন ; ভাবেন—উঠন্ত মূল পত্তনেই চেনা যায়—কোন্ বংশের ছেলে ঘরে আসিল ! কি জানি গতিক কি দাঁড়াইবে ?

অন্য সময় বসিয়া বসিয়া ভাবেন,তাঁহার অবর্তমানে বালকের ভরণপোষণের কি হইবে ? যদি মানুষ করিয়া দিয়াও মারা যান, তাহা হইলেও একটা এমন ব্যবস্থা করিয়া যাইতে চাহেন যাহাতে তাহার ভবিষ্যতে সাংসারিক কষ্ট না ঘটে। কোন্ জমির কি ব্যবস্থা করিবেন, কুসীদ ব্যবসায় করিলে কিরূপ উপার্জন হইতে পারে ইত্যাদি চিন্তায় কর্ণপুর ব্যস্ত থাকেন।

এক এক সময় হঠাৎ যেন আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়া যায়। বিষয়—চিন্তা ।

মনে মনে ভাবেন এ সব কি আসিয়া জুটিল ? সারাদিনে একদণ্ড ইষ্টচিন্তা করিতে পাই না, প্রৌঢ় বয়সে এ দুর্দৈব মন্দ নয় !

প্রতিবেশী রঘুনাথ ভট্টাচার্য অভিযোগ করিলেন, কর্ণপুরের পালিতপুত্র তাঁহার বাড়ীর ময়না পাখীর খাঁচা খুলিয়া পাখী উড়াইয়া দিয়াছে। বালক বাড়ী আসিলে কর্ণপুর জিজ্ঞাসা করিলেন—নীলু, শুনছি তুমি নাকি ওদের পাখী উড়িয়ে দিয়ে এসেছ ?

বালক বলিল—না, বাবা—আমি না....।

একে অপরাধ লঘু নহে, তাহার উপর তাহার মনে হইল এ মিথ্যা কথা বলিতেছে। কর্ণপুরের ধৈর্যচ্যুতি হইল। তাহাকে খুব প্রহার করিলেন।

তাহার বাবা তাহাকে মারিবেন বালক ইহা ভাবে নাই কারণ বাবার হাতে কখনো সে মার খায় নাই। তাহার চোখের সে বিস্ময় ও ভয়ের দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া কর্ণপুর তাহাকে হাত ধরিয়া দরজার কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন—যাও, বাড়ী থেকে বেরোও—দূর হও—মিথ্যা কথা যে বলে তার স্থান নেই আমার বাড়ী....

বালকের ভরসা-হারা দৃষ্টি তাঁহাকে তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধিল, কিন্তু তিনি দৃঢ়-হস্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

অর্ধ দণ্ড পরে তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বহির্দ্বার খুলিয়া দেখিলেন সেখানে বালক নাই। তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। বাড়ীর এদিক-ওদিক খুঁজিলেন—কোথাও দেখিতে পাইলেন না। নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের বাড়ী খুঁজিলেন—কেহ তাহাকে দেখে নাই।

কর্ণপুর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। সন্ধ্যাকাল—বেশীদূর কোথায় গেল? তিনি নিজের হাতে রন্ধন করিতেন—বালক ভৎর্সনা সহ্য করিয়াছে, তাহার জন্য দুই-একটা, সে যাহা খাইতে ভালবাসে, এমন ব্যঞ্জন রন্ধন করিবার কল্পনা করিতেছিলেন—আজ রাত্রে মিষ্ট কথায় কি কি উপদেশ দিবেন ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। বালককে না পাইয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তন্ন তন্ন করিয়া পাড়ার সব বাড়ী খুঁজিলেন ; কেহ সন্ধান দিতে পারে না। রঘুনাথ ভট্টাচার্যের পুত্র শিবানন্দ তাঁহার কাছে বৈদ্যক-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। সে তাঁহাকে বলিল—তিনি রন্ধন করুন, সে আর একবার ভাল করিয়া সকল স্থান খুঁজিতেছে। ইতিমধ্যে যদি বাড়ী ফিরিয়া থাকে দেখিবার জন্য বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কোথায় ? সে বাড়ী আসে নাই।

কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন উঠানের পার্শ্বের গোশালার মধ্যে শিবানন্দ বার বার বালকের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি গিয়া দেখেন, গোশালায় রক্ষিত তৃণরাশির উপর বালক কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—শিবানন্দের ডাকাডাকিতে নিদ্রাজড়িত চোখে উঠিয়া ব্যাপার কি ঘুমের ঘোরে হঠাৎ না বুঝিতে পারিয়া, অর্থহীন দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছে। কর্ণপুর তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া আনিলেন। পরে খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। অভিমানে বালক তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিল না —বহু আদরের কথা বলিয়া ও কাটোয়ার ফেণী বাতাসা কিনিয়া দিবেন অঙ্গীকার করিয়া কর্ণপুর তাহাকে প্রসন্ন করিলেন।

সেদিন রাত্রে কর্ণপুর মনে মনে ভাবিলেন—কাল হইতে ইহাকে একটু একটু ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাই, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এ স্বভাবটা শোধরাইয়া যাইবে।

পরদিন হইতে তিনি তাহাকে অবসর মত নানা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাইতে আরম্ভ করিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা মুখস্থ করাইয়া দিলেন, প্রতি সকালে উঠিয়া বালককে তাঁহার সম্মুখে আবৃত্তি করিতে হয়। ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা পড়িয়া শোনান। সন্ধ্যার সময় বসিয়া বালককে ডাকিয়া বলেন—ঠান্ডা হয়ে বসো, একটা গল্প করি।

পরে মাধবেন্দ্রপুরী উপাখ্যান বর্ণনা করেন।

মহাভক্ত মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে গিয়া শৈল পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দ কুণ্ডের বৃক্ষতলায় সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জনে বসিয়া আছেন, এক গোপাল বালক একভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া আসিয়া পুরীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল, তুমি কাহারও কাছে কিছু চাও না কেন ? বোধ হয় সারাদিন উপবাসী আছ—এই ধরো দুগ্ধ । পুরী আশ্চর্য হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিয়া জানিলে আমি উপবাসে আছি ? বালক মৃদু হাসিয়া বলিল, গ্রামের মেয়েরা জল লইতে আসিয়া তোমাকে দেখিয়া গিয়াছে, এখানে কেহ উপবাসী থাকে না; তাহারাই এই দুগ্ধভাণ্ড দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। ভাণ্ড রহিল, গরু দুহিয়া আসিয়া লইয়া যাইব।

বালক চলিয়া গেল, কিন্তু ভাণ্ড লইতে আর ফিরিল না।...রাত্রে পুরী স্বপ্ন দেখিলেন, সেই বালক আসিয়া নিকটবর্তী এক বনে তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া বলিতেছে, দেখ পুরী, আমি বহুদিন হইতে এই বনের মধ্যে আছি। যবনের আক্রমণের ভয়ে আমার সেবক এইখানে আমায় ফেলিয়া রাখিয়া পালাইয়া গিয়াছে, কেহ দেখে নাই ; শীত-বৃষ্টি-দাবানলে বড় কষ্ট পাই, তুমি আমার একটা ব্যবস্থা ক'রো। অনেকদিন হইতে তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছি—মাধব আসিয়া কবে আমার সেবা করিবে !

মাধবপুরী মঠ স্থাপন করিয়া সেখানে শ্রীগোপাল বিগ্রহ স্থাপন করিলেন।

পর বৎসর নীলাচল হইতে মলয়-চন্দন আনিয়া বিগ্রহের অঙ্গে লেপন করিয়া দিবেন ভাবিয়া ঝাড়খণ্ডের পথে পুরী নীলাচল যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে রেমুনাতে আসিয়া রাত্রিবাসের জন্য তথাকার গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে, ঠাকুরের ভোগের সময় উপস্থিত। কথায় কথায় পুরী মন্দিরের পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপীনাথের ভোগের কি ব্যবস্থা আছে ? পূজারী বলিল, গোপীনাথের ভোগের জন্য অমৃতকেলি নামক ক্ষীর দ্বাদশ মুখপাত্র ভরিয়া সন্ধ্যার পর দেওয়া হয়, অমৃতসমান তাহার আস্বাদ—গোপীনাথের ক্ষীর বলিয়া তাহা প্রসিদ্ধ—অন্য কোথাও তাহা পাওয়া যায়। কথা বলিতে বলিতে ভোগের শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পুরী মনে মনে ভাবিলেন, অযাচিতভাবে কিছু ক্ষীর প্রসাদ পাওয়া যায় না? তাহা হইলে কিরূপ আস্বাদ জানিয়া ঐরূপ ভোগ বৃন্দাবনের মঠে শ্রীগোপাল বিগ্রহের জন্য ব্যবস্থা করি। ভাবিতেই পুরীর মনে লজ্জা হইল—শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া তিনি তথা হইতে বাহির হইয়া গ্রামের হাটে আসিয়া বসিলেন।

অযাচিত-বৃত্তি পুরী বিরক্ত-উদাস

অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস।

রাত্রে গোপীনাথের পূজারী স্বপ্ন পান—গোপীনাথ স্বয়ং তাঁহাকে বলিতেছেন, দেখ, এই গ্রামের হাটে এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছে, তার নাম মাধবপুরী ; তাঁহার জন্য একখণ্ড ভোগের ক্ষীর ধড়ার আঁচলে ঢাকা রাখিয়া দিয়াছি, আমার মায়ায় তোমরা তাহা টের পাও নাই। সে সারাদিন কিছু খায় নাই, শীঘ্র মন্দিরের দ্বার খুলিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে দিয়া এসো.... পূজারী তখনই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, সত্যই বিগ্রহের ধড়ার অঞ্চলে এক পাত্র ক্ষীর চাপা আছে বটে। কে এমন মহা ভাগ্যবান পুরুষ, যাহার জন্য স্বয়ং ঠাকুর ক্ষীর চুরি করিয়াছেন ?....ক্ষীর-পাত্র লইয়া পূজারী গ্রামের হাটে অসিয়া তাহাকে খোঁজ করিয়া বাহির করিলেন। মাধবপুরী একা অন্ধকার হাটচালাতে বসিয়া বসিয়া নাম জপ করিতেছিলেন। পূজারী তাঁহার হাতে ক্ষীর-পাত্র তুলিয়া দিয়া পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, ত্রিভুবনে তোমার সমান ভাগ্যবান পুরুষ নাই ; পায়ের ধূলা দাও, উদ্ধার হইয়া যাই। তোমার জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন।

বালক একমনে শান্তভাবে শোনে। বার বার সে তাঁহাকে প্রশ্ন করে বাবা, কৃষ্ণ কোথায় থাকেন? বৃন্দাবনে?

প্রতিদিন এক প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া কর্ণপুর বলেন—হাঁ হাঁ থাকেন। ইহার পর হইতেই সে সুর ধরে বৃন্দাবন কোথায় বাবা, আমি বৃন্দাবনে যাবো !

কর্ণপুর ভাবিলেন, ইহার কিছুই হইতেছে না দেখিতেছি—আমার পরিশ্রম সবই পণ্ড হইতেছে, এ কিছুই বোঝে না, শুধু বাজে দুষ্টামির দিকে ঝোঁক।

বারবার তাগাদায় বালক কর্ণপুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। কিছু দিন পরে দূর গ্রামে তাঁহার এক ধান্য-ক্ষেত্রের কার্য ধরাইবার জন্য কর্ণপুরের সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হইল । পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়াছিলেন, বালক যেরূপ দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া চোখে চোখে রাখাই ভাল, এক কাজে দুই কাজ হইবে। কর্ণপুর বলিলেন—চল নীলু, আমরা বৃন্দাবনে যাই।

উৎসাহে বালকের রাত্রে নিদ্রাবন্ধের উপক্রম হইল। প্রতি রাত্রে সে জিজ্ঞাসা করে, যাইবার আর কয় দিন বাকি।...গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেদিন রাত্রে শুইয়া সে কর্ণপুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিল—আমি কৃষ্ণকে দেখতে যাব বাবা ! কৃষ্ণ কোথায় গরু চরান বাবা? কাল সকালে উঠে যাব।

পরদিন স্বীয় ধান্যক্ষেত্রে যাইবার সময় কর্ণপুর তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন ও ক্ষেত্র হইতে কিছু দূরে পথের ধারে বসাইয়া রাখিয়া বলিলেন—এখানে চুপ করে বসে থাক, কৃষ্ণ এই পথে যাবেন। উঠে এদিক-ওদিক গেলে কিন্তু আর দেখতে পাবে না। চুপ করে বসে থাক।। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ক্ষেত্রের কার্য শেষ করিয়া কর্ণপুর বালককে লইতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে মহা উৎসাহে বলিল—দেখেছি বাবা, এই মাত্র কৃষ্ণ গরুর পাল চরিয়ে নিয়ে ফিরে গেলেন—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমি দেখতে পেলে না !

কর্ণপুর বুঝিলেন, নির্বোধ বালক গ্রামের রাখালদিগকে গরুর পাল লইয়া ফিরিতে দেখিয়াছে। বলিলেন—চলো, বাড়ী চলো—আমি অনেক দেখেছি—তুমি দেখেছ তো, তাহলেই ভাল ।

তার পরদিন হইতে বালক প্রায়ই বাবার সঙ্গে মাঠে যায় ও পথের ধারে নির্দিষ্ট স্থানটিতে

বসিয়া থাকে। রোজই বাপকে অনুযোগ করে, কেন বাবা এখানে সন্ধ্যার সময় থাকে না, কেন দেখো না ! কোন কোন দিন বলে—কাল আমার দিকে চেয়ে কৃষ্ণ বললেন, আয় না গরু চরাবি ! আমি তোমায় না জিজ্ঞাসা করে যেতে পারিনি। যাবো বাবা কাল ?

প্রতিদিন এক কথা শুনিয়া কর্ণপুরের মনে খটকা লাগিল । বালক যেভাবে কথাগুলো বলে তাহাতে মিথ্যা কথা বলিতেছে বলিয়াও মনে হয় না। ব্যাপারটা কি ? একদিন বালককে বলিলেন, এবার সে-সময় যেন তাঁহাকে সে ক্ষেত্র হইতে ডাকিয়া লয়, তিনিও দেখিবেন।

সন্ধ্যার পূর্বে বালক ছুটিয়া আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—শীগ্‌গির এসো বাবা, কৃষ্ণ আসছেন।

কর্ণপুর বালকের পাছু-পাছু পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। কোথাও কেহ নাই, মাঠের ধারে নির্জন পথ....কিন্তু বালক দুই হাত তুলিয়া মহা উৎসাহে বলিল—ঐ দেখো বাবা—গরুর দল। ঐ যে—ঐ দেখ....আসছেন....

কর্ণপুর বলিলেন—কৈ কৈ....কোন কিছুই তাঁহার চোখে পড়িল না।

বালক বলিল—এইবার দেখেছ তো বাবা ? দেখেছ কত গরু ?....ঐ দেখ, কৃষ্ণ কেমন পোশাক পরে ?....

কর্ণপুর বিস্মিত হইলেন। বালকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে উত্তেজিতভাবে জনশূন্য পথের দিকে চাহিয়া আছে। ভাবিলেন, ইহা মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ নয় তো ?

হঠাৎ কিন্তু সেই নির্জন পথে কর্ণপুরের কানে গেল, সত্য সত্যই যেন একদল গরুর সম্মিলিত পদশব্দ হইতেছে, যেন অদৃশ্য একদল গরু কে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অদৃশ্য বাঁশির তান তাহার সম্মুখের পথ দিয়া একটানা বাজিয়া চলিয়াছে....খুব মৃদু বটে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট !....

অপূর্ব মধুর তান ! জীবনে সেরূপ কখনো তিনি শোনেন নাই !

কর্ণপুরের সর্ব শরীর শিহরিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

বাঁশির সুর একটানা বাজিতে বাজিতে দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে দূরে আরও দূরে গিয়া আম্‌শি ফুলের বনের প্রান্তে মিলাইয়া গেল।

বালক বলিল—দেখলে বাবা ? আমি বুঝি মিথ্যে কথা বলি ?

কর্ণপুর চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।